ফিচার
নক্ষত্রের আগুন ভরা রাতে
জসিম মল্লিক

এক.
১৯৮০ সাল। বরিশালে বি এম কলেজে পড়ি। পত্র পত্রিকা, গল্পের বইয়ের প্রতি প্রবল একটা ঝোঁক তখন থেকেই। বারিশাল পাবলিক লাইব্রেরীতে যাই মাঝে মঝে বই আনতে। আমার এক চাচী ছিলেন খুব বইয়ের পোকা। তার জন্যই মূলত: বই আনতে যেতাম আমি। ওখান থেকেই বইয়ের প্রতি ঝোঁক বাড়ে।
স্কুলে থাকতেই আমাদের ফার্স্টবয় নাসিরের সাথে ক্ষই বিনিময় করতাম। আলাউদ্দিন আল আজাদের তেইশ নম্বর তৈলচিত্র বইটি পড়তে দিয়ে নাসির একদিন বললো, এই ধরণের কাহিনী থেকে কিন্তু সিনেমা হতে পারে। সত্যি সত্যি পরবর্তীতে এটি সিনেমা হয়েছিল। আর আমি তো ক্লাস ফাইভ থেকেই সিনেমা পাগল। স্কুল ফাঁকি দিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়ে মার হাতে মারও খেয়েছি কতদিন। কবরী ছিল আমার প্রিয় নায়িকা। কবরীর হাসি নিয়ে অনেক চিঠি চিত্রালী ও পূর্বানীতে লিখেছি। পরবর্তীকালে ডি এফ পি থেকে প্রকাশিত সচিত্র বাংলাদেশে কিছুদিন চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা করতে গিয়ে কবরীর সাথে পরিচয় হয়েছিল। ইন্টারভিউ করেছিলাম আবদুল জব্বার খান, শেখ নিয়মত আলী, সুমিতা দেবী, মোরশেদুল ইসলাম প্রমুখদের। কে জি মুস্তাফা ছিলেন তখন সচিত্র বাংলাদেশের সম্পাদক। কে জি ভাই আমাকে খুব আদর করতেন। এখনও করেন। ঢাকায় প্রেসক্লাবে আড্ডায় গেলে তার সাথে দেখা হয় এখনও। তিনি মাঝে মাঝে হোমিওপ্যাথির চর্চ্চা করেন। প্রেসক্লাবের গেটেই তার একটা চেম্বার আছে। অবসার জীবন কাটান এভাবে।
আমার ছোট বেলার সিনেমা দেখার একটা গল্প বলি- তখন আমার বয়স তেরো/ চৌদ্দ হবে। বরিশালে বিউটি সিনেমা হলে তখন মর্নিং শো চলতো। শুক্রবার ছিল সেদিন। মর্নিং শোতে তখন সাধারণত: ইংরেজী ছবি চলতো। ছাবিটার নাম ছিল হানিমুন অফ দ্য টেরর। পোষ্টারে উত্তেজক ছবি আর লেখা ছিল ‘শুধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য’। ব্যস আর যায় কোথায়। লুকিয়ে লুকিয়ে টিকিট কেটে ঢুকে পড়লাম হলে। ডিসি ক্লাসে। তখনও ছবি শুরু হয়নি। আমার নির্ধারিত সীটে বসতে যাচ্ছি দেখি আমার আমার বড় ভাইও এসেছেন ছবি দেখতে। বড় ভাইকে আমরা যমের মতো ডড়াতাম, কারণ তিনি খুবই কড়া প্রকৃতির মানুষ। আমি দ্রুত বের হয়ে এসে হলের নিচ তলায় রিয়ার স্টলের টিকেট কেটে ঢুকতে যাচ্ছি দেখি আমার মেঝ ভাইও ঢুকছেন। কি আর করা, অগত্যা সেদিন সিনেমা না দেখেই ফিরে আসতে হয়েছিল। সিনেমা আর বইয়ের নেশাটা আমার আজও যায়নি।
বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরীতেই আমি প্রথম বিচিত্রা পত্রিকাটা দেখি। দু’একটা সংখ্যা পড়ে আমার এমন ভালো লেগে গেল। বিচিত্রার পাঠকের পাতায় আমি কয়েকটা চিঠি পঠালাম , জানতাম না যে ছাপা হবে। কিন্তু আমাকে আশ্চর্য্য করে দিয়ে একদিন একটা চিঠি ছাপা হয়ে গেল। ছাপা অক্ষরে আমার নাম দেখে আমি এমন খুশী হলাম। সেই থেকে শুরু। তখন বিচিত্রার দাম মাত্র ৫০ পয়সা। মা আমাকে স্কুলের টিফিনের জন্য যে পয়সা দিতেন সেটা দিয়ে আমি পত্রিকা কিনতাম। এরপর আমি অন্যান্য পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে নিয়মিত লিখতে থাকি এবং সেগুলো ছাপাও হয়। যেমন আমি লিখতাম দৈনিক বাংলা, সংবাদ, ইত্তেফাক, চিত্রালী, পূর্বানী, বেগম, ঝিনুক ইত্যাদি পত্রিকায়।
বিচিত্রার ব্যাক্তিগত বিজ্ঞাপন বিভাগটি তখন খুবই জনপ্রিয়। প্রতি শব্দ ৫০ পয়সা দিয়ে বিজ্ঞাপন দেয়া একটি অভাবনীয় ব্যাপার মনে হলো আমার কাছে। এবং আমি একদিন সত্যি সত্যি বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করলাম। ফলাফল হলো অপ্রত্যাশিত। আমি প্রচুর চিঠি পেতে শুরু করলাম। এর আগেও চিঠি পেতাম কিন্তু বিচিত্রার ফলাফল অভাবনীয়। এক পর্যায়ে আমার অসংখ্য পত্র বন্ধু হয়েছিল এবং তা টিকে ছিল অনেক দিন পর্যন্ত। তো ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন তখন সত্যি একটা আলাদা মাত্রা যোগ হলো, বিশেষ করে তরুন তরুনীদের মধ্যে। পয়সার

বিনিময়ে মনের অব্যক্ত কথা প্রকাশ করার এক আশ্চর্য্য মাধ্যম হয়ে উঠলো বিচিত্রা । আমি তখন এত চিঠি পেতাম এবং লিখতাম যে ডাক বিভাগ কর্তৃপক্ষ আমার জন্য একটা সাব পোষ্ট অফিস খুলেছিল ।

দুই.

একদিন ঢাকা পাড়ি জমালাম । মনে মনে উদ্দেশ্য বিচিত্রার সাথে যোগসূত্র গড়ে তোলা এবং বড় বড় লেখকদের সামনা সামনি দেখা । কিন্তু কিভাবে সেটাই জানি না । ব্যক্তিগতভাবে আমি একটু অন্তর্মুখী টাইপের । নিজেকে তুলে ধরার কোন কায়দা কানুনই জানি না । আজও না ।
তো একদিন দোয়া দুরুদ পড়ে বিচিত্রা অফিসে গেলাম । দৈনিক বাংলার দোতলায় । বিখ্যাত ১,ডি আই টি এভিন্যূ । অতি পুরাতন লিফট । উঠতে ভয় করে । তো প্রথম দিন বিচিত্রার পিওন মুনির ভাই পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছিলাম । পরবর্তীতে দেখেছি মুনির ভাই কত দাপটের ছিলেন । স্বয়ং প্রেসিডেন্ট জিয়া মুনির ভাইকে নামে চিনতেন বলে শুনেছি । মুনির ভাইকে খুশী করতে পারলে অর্ধেক কাজ হয়ে যেতো ।
এও শুনেছি অনেক লেখকই নাকি দৈনিক বাংলা ভবনের আশে পাশে ঘুরতেন । একবার যদি ওখানে পা রাখা যায় । একবার যদি লেখা ছাপানো যায়! অনেকেই বিচিত্রায় লেখা ছাপা না হলে নিজেদের লেখক ভাবতেই সাহস পেতেন না । বিচিত্রার তখন এমনই দাপট । আর যারা ওই পত্রিকায় লিখতেন, সাহসী সব রিপোর্ট করতেন তারা না জানি কেমন মানুষ । সম্পাদকের কাছে পর্যন্ত যাওয়া তো অনেক পরের ব্যাপার । তখন বিচিত্রায় চাকুরী করতেন শাহরিয়ার কবির, চিন্ময় মুৎসুদ্দী, কাজী জাওয়াদ, মাহমুদ শফিক, মাহফুজুল্লাহ, আলমগীর রহমান, শামসুল ইসলাম আলমাজীর মত সব জায়ান্টরা ।
তো ওইরকম একটা কঠিন জায়গায় আমার মতো সদ্য মফস্বল থেকে আসা তরুণের ঢুকতে চাওয়া একটু বাড়াবাড়ি না! আর এই শহরে এ লাইনে আমার কেউ নেইও যে আমার কথা কেউ সুপারিশ করবে । আমার চৌদ্দ গোষ্ঠির মধ্যে কেউ লেখা লেখিও করে না । আমার একটাই ভরসা ছিল বিচিত্রায় আমি গন্ডা গন্ডা চিঠি পাঠাই এবং প্রায়ই তা ছাপা হয় । তো মুনির ভাইকে আমার নাম বলতেই চিনে ফেললেন এবং বললেন আপনাকে শামীম আপা খুঁজছেন । আমি আমতা আমতা করে বললাম, তিনি কে? মুনির ভাই বললেন, শামীম আজাদ কে চেনেন না! আজকেই যান দেখা করে আসেন বাসায় । আমার তখনও ধারনা ছিল শামীম আজাদ পুরুষ ।
শামীম আজাদের ধানমন্ডি পনেরো নম্বরের বাসায় গেলাম দেখা করতে । বোঝা যায় বেশ বড়লোক । তিনি তখন বিচিত্রার জীবন এখন যেমন বিভাগের বিভাগীয় সম্পাদক । আমি তার বিভাগে লিখতাম বরিশাল থেকে । তিনিই আমাকে প্রথম বিচিত্রায় লিখতে বললেন এবং বিচিত্রা অফিসে নিয়মিত আসতে বললেন । আমি তখনও জানি না ঢাকায় থাকবো কিনা । তার এক কথায় আমি ঢাকায় থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম । জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত । ভর্তি হলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে । শুরু হলো নতুন এক সংগ্রামী জীবন ।

তিন.

প্রথমদিন বিচিত্রা অফিসে ঢুকে একজন কালো মতো যুবককে দেখলাম পিন দিয়ে পেপাড় কেটে নিউজপ্রিন্টে গাঁথছে । এই মানুষটি হচ্ছে ইরাজ আহমেদ । দৈনিক বাংলার ডাক সাইটে সম্পাদক আহমদ হুমায়ূনের ছেলে । সে তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র এবং বিচিত্রার কন্ট্রিবিউটার । এটাই ছিল বিচিত্রার নিয়ম । কন্ট্রিবিউটাররা কাজ শিখবে, পড়াশুনা শেষে যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারলে চাকুরী হবে । ইরাজ সেদিন আমাকে দৈনিক বাংলার বিখ্যাত চা খাইয়েছিল । কালো চা ।
১৯৮৩ সালের শেষ দিকের কথা । তখন আর এক যুবককে দেখলাম, তিনি আরিফ রহমান শিবলী । পরবর্তীতে আরো কাজ করেছে ফয়জুল আহসান শামীম, মাহফুজুর রহমান, মালিক আল ইমরান এরা । সবাই পার্ট টাইমার । ছাত্র ।

১৯৮৪ সালে প্রথম বিচিত্রা ঈদ ফ্যাশন প্রতিযোগিতা শুরু হলো শামীম আপার নেতৃত্বে। আমি,শিবলী এবং করভী মিজানকে নিয়ে এই টীম। করভী তখন আঠারো বছরের এক তরুনী এবং গাড়ি ড্রাইভ করে। ১৯৮৬ সালে বিচিত্রায় এলেন মঈনুল আহসান সাবের, মিনার মাহমুদ। নিয়মিত লেখক হিসাবে ইরাজ, শামীম, মাহফুজ, শিবলীর নাম প্রিন্টার্স লাইনে ছাপা হলো। বিচিত্রার প্রিন্টার্স লাইন বিরাট বড় কিছু। সেবার আমার নাম ছাপা না হওয়ায় মিনার ভাইকে দ:খ করে বললাম, মনে হচ্ছে পৃথিবীটা ওলট পালট হয়ে গেছে।
শামীম আপা ছাড়া আমার হয়ে কথা বলার তখন কেউ ছিলনা। সম্পাদকের কাছে কথা পৌঁছানো অত সহজ ছিল না। আমি নিজে চেষ্টা করিনি কখনো। সাহসও পাইনি। অবশেষে ১৯৮৮ সালে আমার ও এমদাদ হকের নাম বিচিত্রার প্রিন্টার্স লাইনে শোভা পেলো। এমদাদ শামীম আপার ফ্যাশন টীমের অন্যতম সদস্য হলেন। প্রায় চৌদ্দ বছর বিচিত্রার সাথে জড়িত থাকাকালে অনেক প্রতিভাবান রিপোর্টার এসেছেন। এদের মধ্যে মিনার মাহমুদ, আসিফ নজরুল, আশরাফ কায়সার, সেলিম ওমরাও খান, মিজানুর রহমান খান এদের নাম উল্লেখ করা যায়। কন্ট্রিবিউটাররাও ছিলেন প্রতিভাবান। যেমন আনোয়ার শাহাদত, ফারিয়া হোসেন প্রমুখ। এছাড়াও বিচিত্রার শেষ পর্যায়ে এসেছিলেন মোহসিউল আদনান, গোলাম মোর্তোজা, জয়ন্ত আচার্য সহ আরো অনেকে। এদের বাইরেও অনেক বিশিষ্ট লেখক সাংবাদিকরা বিচিত্রায় লিখতেন। এরা ছিলেন অতিথি লেখক। এই দীর্ঘ দিন গুলোতে অনেকের আসা যাওয়াই দেখেছি। এরপর বিচিত্রার যুগ শেষ হলো আকস্মিক। ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে দৈনিক বাংলা ট্রাষ্ট বন্ধ করে দিলেন।

চার.
এরপর সাপ্তাহিক ২০০০ এর যুগ। একঝাক তরুণ নিয়ে ১৯৯৮ সালে শুরু হলো এর সাহসী যাত্রা। মিডিয়া ওর্য়াল্ডের আর একটি প্রকাশনা। মাত্র কয়েকজন তরুনকে সাথে নিয়ে পরিকল্পনা চলছিল পত্রিকা প্রকাশনার। এরা হলেন মিজান, আদনান, মোর্তোজা প্রমুখ। এই সময়টায় শাহদত ভাইয়ের একটু বেশী কাছে আসার সুযোগ পেলাম। সময়ের হিবাবে সবচেয়ে বেশী তার সাথে ছিলাম অরুন চৌধুরী এবং আমি। প্রথম দিকে মিজানুর রহমান খান, আসিফ নজরুল, আশরাফ কায়সার, মোহসিউল আদনান, গোলাম মোর্তোজা, এদের নিয়ে শুরু। এরপর অনেকেই এসেছেন যেমন সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু, জয়ন্ত আচার্য, বদরুল আলম নাবিল, জব্বার হোসেন, বিজলী হক প্রমুখরা। আবার অনেকে চলেও গেছেন। মাত্র কয়েক বছরে ২০০০ও বিচিত্রার মতো জনপ্রিয় পত্রিকা হতে পেরেছে। সর্বশেষ মোর্তোজা চমৎকারভাবে ২০০০ এর সম্পাদকের দ্বায়িত্ব পালন করছে। এবছরই সাপ্তাহিক ২০০০ এর দশ বছর পূর্তি হলো। এক দশকের লগ্নে মনে পরে তার শ্রষ্ঠার কথা।

আমাদের প্রান প্রিয় সম্পাদক শাহদত চৌধুরী আমার দৃষ্টিতে ছিলেন এক অসম্ভম আধুনিক ও সাহসী মানুষ। তার সম্পর্কে অল্প কথায় কিছু বলা আমার পক্ষে সত্যি কঠিন। অনেক টুকরো টুকরো স্মৃতি তো আছেই। শেষ বার তার সাথে দেখা হয় ২৬ জুন ২০০৩ সালে। ২০০০ অফিসে আমি সপরিবারে এসেছিলাম আমার কানাডা আসার দু'দিন আগে। সেটা ছিল আমার বিদায় অনুষ্ঠান। শাহদত ভাইকে সেদিন বেশ আবেগ প্রবণ দেখেছি। প্রায় ২৩টি বছর তার সাথে আমার পার হয়েছে। এরপর আর তাকে দেখিনি, আর কখনো দেখবো না। ২০০৪ সালে যখন নিইউয়র্ক এসেছিলেন তখন আমার খুব যাওয়ার ইচ্ছা ছিল দেখা করতে। কিন্তু শাহদত ভাই বললেন টরন্টো নতুন এসেছো এখন আসতে হবে না। আমিই আসবো কানাডা একবার। শাহদত ভাইর আর কানাডা আসা হয়নি। যিনি সারা পৃথিবী ঘুরেছেন তিনি আর কোথাও যাবেন না। যখনই ফোন করতাম খুব খুশী হতেন। শেষের দিকে দু' একবার কথা বলতে পারিনি অসুস্থতার কারণে। কারণ কথা বলা ছিল নিষেধ। সব সময় বলতেন কিরনকে বলো বেশী বেশী লিখতে. পিয়ালের সাথে যোগাযোগ রাখবে, ইমিগ্রেশন নিয়ে বেশী বেশী লিখতে বলতেন। কানাডার তৎকালনি হাইকমিশনার রফিক আহমেদ খান যখন আসেন দায়িত্বে শাহদত ভাই তখন নিউইয়র্ক।

হাইকমিশনার মহোদয়কে আমার কথা বলেছিলেন। আর আমাদের হয়ে কথা বলবেন না তিনি। প্রবাসে আমরা কতটা একা হয়ে গেলাম।
২৮ নভেম্বর রাত দশটা। লসএঞ্জেল থেকে পিয়ালের ফোন। জসিম ভাই একটা খারাপ খবর আছে। আমি খুব চমকে উঠি। পিয়ালের কান্নাভেজা কণ্ঠই আমাকে বার্তা পৌঁছে দেয়। আমার হাত থেকে ফোনটা পড়ে যেতে চায়। দু'দিন আগেও আমি শাহদত ভাইকে স্বপ্নে দেখেছি। হাস্যোজ্জ্বল শাহদত ভাই খুব হেসে হেসে গল্প করছেন শহিদুল্লাহ খান বাদল ভাইয়ের সাথে। আকবর হায়দার কিরনকে ফোন করি, সে আগেই শুনেছে, কিরন ভাই জ্যাকসন হাইটসের রাস্তায় দাড়িয়ে কাঁদছেন। মোর্তোজা, অরুন দা, শাসা কে ফোন করে শান্তনা পেতে চাই। লন্ডনে শামীম আপা কাঁদেন, অটোয়ায় ফারুক ফয়সাল বিষন্ন এক লেখা লেখেন তার ওয়েব সাইটে। নিউইয়র্কে মিনার মাহমুদ তার অনেক স্মৃতির কথা বলেন, বিল্টু ভাই কাঁদেন। ফোন করি ডিজিটাল ওয়ানের জিকুকে। শান্ত না পাই না। শাহাদত চৌধুরী নেই একথা বিশ্বাস করা কঠিন আমাদের জন্য। মোর্তোজা ফোনে বললেন জসিম ভাই আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না। আসিফ নজরুল আর মোহসিউল আদনানের লেখা পড়ে চোখে পানি চলে আসে।

পাঁচ
শাহদত ভাই বিচিত্রার মাধ্যমে মধ্যবিত্তের জীবন ধারা বদলে দিয়েছিলেন। বিচিত্রার মাধ্যমে প্রথম ফ্যাশনের ধারা শুরু হয় বাংলাদেশে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের এবং জামায়াত বিরোধী কণ্ঠস্বর ছিল বিচিত্রা। সমস্ত কুপমুন্ডকতা, ধর্মান্ধতা আর এস্টাব্লিষ্টের বিরুদ্ধেই বিচিত্রা ছিল সোচ্চার। মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও চিন্তার পরিবর্তন, প্রথম বারের মতো ফটো সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করে, যা আজকে জাতীয় রুপ পেয়েছে।
বৃহৎ কলেবরে ঈদ সংখ্যা প্রকাশের ধারা বিচিত্রার শুরু। ঈদ সংখ্যায় তখন থেকেই উপন্যাসের প্রচলন হয়। বিচিত্রা প্রকাশ করে বছরের আলোচিত চরিত্র, ব্যক্তি ও বিষয় ভিত্তিক এ্যালবাম, রান্না ও রাশিচক্র প্রভৃতি। ঘটনার গভীর থেকে গভীরে গিয়ে প্রচ্ছদ কাহিনী রচনার ধারাটি বিচিত্রার।
রণবীর টোকাই বিচিত্রার সৃষ্টি। টোকাই সমাজের অবহেলিত মানুষের কথা বলে। টোকাই সমাজের একটা আলোচিত চরিত্র। বিচিত্রা এতটাই জনপ্রিয় ছিল যে ম্যাগাজিন বলতেই ছিল বিচিত্রা।
আর এ সব কিছুর মূলে যিনি ছিলেন তিনি শাহাদত চৌধুরী। শাহাদত চৌধুরী বাংলাদেশে সাময়িকী প্রকাশনার জগতে বিপ্লব এনেছিলেন। তিনি এক্ষেত্রে আদর্শ হয়ে থাকবেন সাংবাদিকতার জগতে।
জীবানন্দের ভাষায় বলতে হয়-
"আমি চলে যাব, তবু সমুদ্রের ভাষা
র'য়ে যাবে, তোমার পিপাসা
ফুরাবে না, পৃথিবীর ধূলো, মাটি তৃণ
রহিবে তোমার তরে, রাত্রি আর দিন।
র'য়ে যাবে, র'য়ে যাবে তোমার শরীর-
আর এই পৃথিবীর মানুষের ভীড়।"

জসিম মল্লিক: সাহিত্যিক, সাংবাদিক
কানাডা